দর্শন ও প্রগতি, বর্ষ ৩৫ ও ৩৬ : ১ম ও ২য় সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১৮, ২০১৯

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ও বৈষ্ণব দর্শন

মো. তোফাজ্জল আলী*

বাঙালি মানবতাবাদী দার্শনিক মহানামব্রত ব্রহ্মচারী (১৯০৪-১৯৯৯) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিক্ষায় ছিলেন সুপণ্ডিত। বেদ, উপনিষদের নিরিখে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তাধারার তুলনামূলক এবং সমন্বয়ধর্মী আলোচনার পাশাপাশি, শঙ্কর ও রামানুজের বেদান্ত-ভাষ্যের বিচার-বিশ্লেষণ সূত্রে তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বেদান্ত-ভাষ্য মূলত শ্রীজীব গোস্বামীর বেদান্ত-ভাষ্যের এক সহজ সরল ও পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণাত্মক আলেখ্য উপস্থাপন করেছেন। তিনি নিজেকে জীবনব্যাপী নিয়োজিত রেখেছিলেন বিদ্যাচর্চা, ঐশী উপাসনা ও মানবকল্যাণের মহান ব্রতে। ধর্ম, দর্শন ও চিরায়ত সাহিত্য তথা সবক্ষেত্রেই তাঁর ছোঁয়া আছে। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে অহিংস অন্নত্যাগী, দেশপ্রেমিক শ্রেষ্ঠ সন্তান মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বাংলাদেশের মানুষের পরিচিতি অত্যল্প। তাই এ মহান ব্যক্তির জীবনদর্শন ও কর্মতৎপরতা উন্মোচনের প্রয়াস নেয়া হয়েছে এবং বৈষ্ণব দর্শনের স্বরূপ-প্রকৃতি, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন তথা মহানামব্রত ব্রহ্মচারির বৈষ্ণবদর্শন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এ প্রবন্ধে।

'সনাতন ধর্ম' অন্যতম প্রাচীনতম ধর্মমত। সনাতন ধর্মে পাঁচটি মৌলিক সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে। এ সম্প্রদায় গুলো হচ্ছে: শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর ও গানপত্য। খ্রিস্টধর্মে রয়েছে প্রধানত তিনটি সম্প্রদায়- ক্যাথলিক, প্রটেস্ট্যান্ট ও এ্যংলিকান কমিউনিয়ন।[১] ইসলাম ধর্মের চিন্তাগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা যায়-[২] (ক) ধর্মতাত্ত্বিক সম্প্রদায় যেমন, মরজিয়া, কাদারিয়া, জাবারিয়া এবং সিফাতিয়া (খ) রাজনৈতিক সম্প্রদায়- যেমন, খারেজি, সুন্নি এবং শিয়া (গ) দার্শনিক সম্প্রদায়- মুতাযিলা, আশারিয়া, সূফী ও ফালাসিফা। বৌদ্ধ ধর্মেও দুটো সম্প্রদায় হচ্ছে- হীনযান ও মহাযান। জৈন ধর্মে রয়েছে- শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর। বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়, উপসম্প্রদায় কালক্রমে মূলত ধর্মীয়, নৈতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ও আন্তর্জাতিক কারণে উদ্ভব ঘটেছে। ধর্মের খুঁটিনাটি বিষয় অর্থাৎ ব্যবহারিক, ভজন ও সাধন পদ্ধতি নিয়ে মতবিরোধ

* সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, বৃন্দাবন সরকারি কলেজ, হবিগঞ্জ

থাকলেও মূলনীতি সমূহে প্রত্যেক ধর্মই অটল ও অবিচল। এ প্রসঙ্গে বেদান্ত দর্শনে যে ছয়টি মতবাদ প্রচলিত আছে এর প্রবক্তা ও প্রচারকগণ হলেন- (১) অদ্বৈতবাদ- শংকরাচার্য (২) দ্বৈতবাদ- মধবাচার্য (৩) বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ- রামানুজাচার্য (৪) স্বাভাবিক দ্বৈতাদ্বৈতবাদ- নিম্বার্কাচার্য (৫) শুদ্ধাদ্বৈতবাদ- বল্লভাচার্য (৬) অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ- শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।[৩] এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, কেবল শংকরাচার্য ছাড়া অন্য সব আচার্য ভক্তিবাদ বা প্রেমবাদ বা বৈষ্ণববাদকেই সমর্থন করেন।

বৈষ্ণব দর্শনের উৎস

বৈষ্ণব ধর্মমতের সার বা তত্ত্বকথা নিয়েই গড়ে উঠেছে বৈষ্ণব দর্শন। 'বিষ্ণু' শব্দ হতে বৈষ্ণব শব্দের উৎপত্তি।[৪] বিষ্ণুর উপাসকদের বলা হয় বৈষ্ণব। বৈষ্ণব মতে সগুণ ঈশ্বরই পরমতত্ত্ব। ঈশ্বরকে বিষ্ণু বা নারায়ণ, হরি বা কৃষ্ণ ইত্যাদি বলা হয়।[৫] বিষ্ণুর উপাসনা বিষয়ে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন দলিল ঋগবেদ। ঋগবেদে অনেক সূক্তে বিষ্ণুর উল্লেখ আছে।[৬] এরকম একটি সূক্তের একটি মন্ত্র উদ্ধৃত হল

"তমু স্তোতারঃ পূর্ব্যং যথা বিদ ঋতস্য গভং জনুষাপিপর্তন।
আস্য জানন্তো নাম চিদবিষিক্তনমহস্তে বিষ্ণু সুমতিং ভজামহে"[৭]

অর্থ- "হে স্তোতৃগণ! প্রাচীন যজ্ঞের গর্ভভূত বিষ্ণুকে যেরূপ জান সেরূপেই স্তোত্রাদিদ্বারা তাঁর প্রীতি সাধন কর। বিষ্ণুর নাম জেনে কীর্তন কর। হে বিষ্ণু! তুমি মহানুভব, তোমার সুমতি আমরা ভজনা করি।"

এ প্রসঙ্গে শ্রীজীব গোস্বামী তাঁর ব্যাখ্যায় বলেন,

> হে বিষ্ণু! তোমার নাম চিৎ অর্থাৎ চৈতন্য স্বরূপ এবং সেই হেতু তাহা মহঃ অর্থাৎ স্বয়ং প্রকাশ। সেই নামের ঈষৎ মহিমা জানিয়া অর্থাৎ উচ্চারণাদির মহাত্মাদি পূর্ণভাবে না জানিয়াও যদি অক্ষর মাত্র উচ্চারণ করি, তবে তোমার বিদ্যা বা সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হইব।[৮]

এ প্রসঙ্গে মহানামব্রত ব্রহ্মচারী তাঁর গবেষণা গ্রন্থ বৈষ্ণব বেদান্তের সূচনা অধ্যায়ে বলেন,

> Vedanta philosophy, literally "the end of the wisdom teaching," is the name given to the essential purport of the principal Upanisads that were brought out and systematized in five hundred and fifty-five aphorisms attributed to the sage Badarayana. Being written in aphoristic form, this work of great veneration had to be commented upon. Dozens of commentaries have been written upon

these aphorisms by the foremost thinkers of the country. Judging from the standpoint of originality, depth, and their bearings on the religion and culture of India, the commentaries of Sankara, Ramanuja, Maddhva, Ballava, Nimbarka and Baladeva are regarded as of highest importance and greatest influence. All these philosophers and their disciples are called Vedantists.[৯]

বেদব্যাস পদ্মপুরাণের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৮২ হতে ১১০ শ্লোকে বৈষ্ণবদের লক্ষণ কী এবং কী উপায়ে তাঁদের বলা যাবে তা সংক্ষেপে নিম্নরূপে প্রকাশ করা যায়-

> ভগবান বৈষ্ণবদেরকে ছাড়া এক মুহূর্তও থাকতে পারে না। কারণ বৈষ্ণবরা ভগবানের বন্ধু। যারা একাদশী পালন করে এবং তাঁর (ভগবানের) নামকীর্তন করে তারাই বৈষ্ণব। যারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকে সমান চোখে দেখে, অতিথিদেরকে সম্মান করে, দুর্বলদেরকে সাহস যোগায়, বিদ্যানুরাগীদেরকে বিদ্যা দান করে, ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্থ ও পীড়িতদের খাবার ও পানির ব্যবস্থা করে এবং রোগীর সেবা শুশ্রুষা করে, পিতামাতা ও গুরুজনদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে, যাদের কাম, ক্রোধ, হিংসা, দম্ভ, লোভ, মোহনেই তারাই বৈষ্ণবজন।[১০]

বৈষ্ণব দর্শন অনুযায়ী স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে যে সম্বন্ধ তা নিছক ভেদের সম্বন্ধ নয়, আবার একেবারে অভেদের সম্বন্ধও নয়। কারণ তাতে ভেদ ও অভেদ যুগপৎ বিদ্যমান। যেমন আগুন ও আগুনের দাহিকা শক্তি পৃথক নয়, একসঙ্গে বিদ্যমান। আবার আগুনের তাপকে বাইরে থেকেও অনুভব করা যায়। বৈষ্ণবীয় দৃষ্টিতে রাধা ও কৃষ্ণের সম্বন্ধ ঠিক এরকম। আবার ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এ দ্বৈতবাদই দেখা দেয় অদ্বৈতবাদরূপে। কারণ বৈষ্ণব মতে সৃষ্টি ও স্রষ্টা ভিন্ন হয়েও অভিন্ন, দুই হয়েও একান্ত। যেমন বলা হয়েছে-

"যদ্যপি রাধাকৃষ্ণ সর্বদা অভিন্ন
তথাপি লীলার লাগি যুগপদ্বিভিন্ন।"[১১]

অর্থাৎ, "রাধাকৃষ্ণ সর্বদা অভিন্ন হৃদয় হয়েও লীলার নিমিত্তে কখনো ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে থাকে।"

সুতরাং বৈষ্ণব দর্শন দ্বৈতবাদী হয়েও অদ্বৈতবাদী। তবে এ অদ্বৈতবাদ শংকরের অদ্বৈতবাদ নয়। একে বরং অভিহিত করা যায় দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বলে। উপমহাদেশের বিভিন্ন ধর্ম ও দার্শনিক সম্প্রদায়ের দ্বৈত, অদ্বৈত ও দ্বৈতাদ্বৈত ভেদ নিয়ে যতই মতভেদ থাকুক না কেন প্রেমধর্মেও সাধক হিসেবে তাঁরা সবাই একমত। প্রেমিক ও ভক্ত কবি চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতি, রবীন্দ্রনাথ, সন্তকবি দাদু ও কবীর, বাউল-কবি, সুফি-কবি সবাই এ প্রেমের আদর্শে সগোত্র ও সমদর্শী।

বৈষ্ণব মতে, পরম পুরুষ কৃষ্ণ সবার প্রিয়, কারণ তিনি একাধারে চির সুন্দর, চিরমধুর, চিরনবীন ও চিরকরুণাময়। তার মধুর রূপের উপাসনা এবং তাঁর প্রতি ভক্তি ও প্রেমনিবেদনই সাধনার প্রথম ও প্রধান উপায়। ভাব ও ভক্তির যোগই মনিকাঞ্চন যোগ। যথার্থ সাধক নিয়ত বিভোর থাকেন ভক্তি ও ভাব নিয়ে। ভক্তির সঙ্গে ভজনা করে শ্রীকৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করলেই কেবল মায়ামুক্ত হওয়া যায়। এই বিশুদ্ধ ভক্তিতে কোনো উৎকণ্ঠা থাকে না, থাকে শুধু স্নিগ্ধ প্রেমের বাসনা। প্রেমের এই নিবিড়তা ও আন্তরিকতাই স্পষ্ট ও মূর্ত হয়ে আছে রাধা চরিত্রে।

বৈষ্ণব মতে, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এ পাঁচটি অতি উৎকৃষ্ট বিমল আনন্দায়ক ভাব। কান্তা বা মধুর ভাব এদের মধ্যে সবচেয়ে উন্নত ও সর্বোৎকৃষ্ট। কারণ এ ভাবের মধ্যে সব ভাবের মিশ্রণ রয়েছে। যেমন, সেবক সন্তুষ্ট কেবল প্রভুর আজ্ঞা পালন করে, মা আনন্দ পান সন্তান স্নেহের মাধ্যমে, স্ত্রী দাম্পত্য সুখ অনুভব করেন পতিসোহাগিনী হয়ে। কিন্তু মধুর ভাবের সাধক এ ধরনের কোনো একটি বিশিষ্ট সুখের প্রত্যাশী নন। তিনি অনুভব করেন সর্বাত্মক সুখ এবং উদ্বেলিত হন অনির্বচনীয় আনন্দ লহরিতে।

বৈষ্ণব মতে সৎ চিৎ ও আনন্দ এ তিনটি নিয়ে গঠিত পরম সত্তা শ্রীকৃষ্ণের স্বরুপ এবং হ্লাদিনা, সন্ধিনী ও সংবিদ- এ তিনটি তাঁর শক্তি। প্রেমের উৎপত্তি হ্লাদিনা শক্তি থেকে। প্রেম আর কাম এ দুটিকে প্রায়শই গুলিয়ে ফেলা হয়। বৈষ্ণবীয় দৃষ্টিতে এ দুটি এক জিনিস নয়।

চৈতন্য চরিতামৃতে মধ্যলীলার ১৯ পরিচ্ছেদে এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে:

আত্মোন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তাকে বলি কাম
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেমনাম
কামের তাৎপর্য নিজ সম্ভোগ কেবল
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য প্রেম মহাবল [১২]

অর্থাৎ, "স্বীয় ইন্দ্রিয় প্রীতির ইচ্ছাকে বলা হয় কাম আর পরমাত্মার প্রীতির ইচ্ছাই প্রেম নাম ধরে। নিজের সম্ভোগস্পৃহাই কাম। পরমাত্মার নিমিত্তে যে আনন্দ তা হচ্ছে সুমহান প্রেম।"

নিষ্ঠাবান ভক্ত, শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্যভাব উত্তীর্ণ হয়ে ক্রমশ বিভোর হয়ে যান মধুর মহাভাবে। এ প্রক্রিয়ায় ভজন করার নাম মধুর ভজন, মধুর ভজনের অন্য এক নাম গোপী ভজন। এ ভজন নিঃস্বার্থ ও মধুর। মহাভাব অপার্থিব ও লোকাতীত।

শ্রী চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে অনেক বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রচলিত ছিল। গুপ্ত সম্রাটদের সময় থেকেই বৈষ্ণবীয় ভাব বিস্তার লাভ করতে থাকে। পঞ্চোপসনার অন্যতম এই বৈষ্ণব মতবাদ।[১৩] বৈষ্ণবদের সবচেয়ে প্রিয় গ্রন্থ শ্রীমদভগবত গীতা। এই গ্রন্থ ছাড়াও নারদভক্তিসূত্রম ও শাকিণ্ডল্যসূত্রম এ বিষয়ে দুটি প্রধান অবলম্বন। বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীর অন্যতম রুপ গোস্বামী লেখেন 'ভক্তিরসামৃত সিন্ধু' পণ্ডিত মধুসূদন সরস্বতী লেখেন- 'ভগবদভক্তি রসায়ন'। সবচেয়ে প্রণালীবদ্ধ আলোচনা শ্রী জীব গোস্বামীর 'ভক্তিসন্দর্ভ'। এ সব গ্রন্থে ভক্তিতত্ত্ব/বৈষ্ণব মতবাদের যে বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে তার সারসংক্ষেপ এভাবে দেখানো যেতে পারে

ভক্তি/প্রেম হৃদয়ভিত্তিক যুক্তিভিত্তিক নয়,
ভক্তি সদাচারণমূলক,
প্রেম বর্ণাশ্রম মানে না,
গুরুর বিশেষ স্থান,
এবং জ্ঞান ও ক্রিয়াকাণ্ডবিরোধী।

এ প্রসঙ্গে শ্রীধর স্বামীপদ সহজভাবে বলেছেন-

"জ্ঞান ও কর্ম মাপা যায়, কিন্তু ভক্তি ও
কৃষ্ণ নামের শক্তি মাপা যায় না"।[১৪]

বৈষ্ণব দর্শন (গৌড়ীয় বা বঙ্গীয়)

বৈষ্ণবাচার্যদের লীলাবাদী বৈষ্ণব বেদান্তের মূল স্রোত হল শ্রীচৈতন্যের (১৪৮৬ খ্রি.-১৫৩৩ খ্রি.) উপদেশ ও শিক্ষা যা শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চৈতন্যচরিতামৃত'(১৬১৬ খ্রি.) গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন এবং যার বিস্তৃত দার্শনিক ভাষ্য পাওয়া যায় সনাতন গোস্বামী ও রুপ গোস্বামীর ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে এবং শ্রীজীব গোস্বামীর ষট্সন্দর্ভ-তত্ত্বসন্দর্ভ, শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, ভাগবতসন্দর্ভ, পরমাত্মসন্দর্ভ, ভক্তিসন্দর্ভ প্রীতিসন্দর্ভ ইত্যাদি গ্রন্থে। উল্লিখিত গ্রন্থের দর্শনকে বলা হয় 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ'।[১৫] যেহেতু ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে যে সাম্য ও ভিন্নতা বা অভেদ ও ভেদ আছে তা যুক্তি বা বুদ্ধির দ্বারা বোঝা যায় না; বরং বেদান্তের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষ্য *ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের* প্রামাণিকতাকে স্বীকার করে শ্রদ্ধার সাথে মানতে হবে।

রামানুজাচার্য এবং মধ্বাচার্য ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি ও ঐশ্বর্যেও দ্বারা অভিভূত ছিলেন; কিন্তু নিম্বার্কাচার্য (১০৫৬ খ্রি.-১১৬৫খ্রি.) ঈশ্বরের মাধুর্য কৃপার দ্বারা বেশি প্রভাবিত

ছিলেন। বল্লভাচার্যের মতে ঈশ্বর লাভের জন্য কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের থেকে ভক্তিযোগ শ্রেষ্ঠ। শ্রীচৈতন্য আর একধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেছিলেন যে উত্তমা ভক্তির ও পরপর তিনটা স্তর আছে, এবং ঘোষণা করেছিলেন যে প্রেমভক্তির পাঁচটি স্তরের (শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, ও মধুর) মধ্যে ব্রজের গোপীদের মধুর রস সর্বশ্রেষ্ঠ এবং কলিযুগে উত্তম ভক্তি লাভের শ্রেষ্ঠ উপায় হল তারকব্রহ্ম হরিনাম (হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে) জপ করা ও কীর্তন করা।

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী জন্ম ও তৎপরবর্তী সময়ের বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

বাংলার রুপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে বাঙালি কবি দ্বিজেন্দ্র লাল রায় এর অনুভূতি–

ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে এক সকল দেশের সেরা
ও সে যে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি
সে যে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি।

সামাজিক অবস্থা

তৎকালীন সামাজিক বন্ধন অত্যন্ত শক্তিশালী, মমতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল। হিন্দু-মুসলমান তথা অন্যদের সাথে মধুর সহাবস্থান, পারস্পরিক সম্প্রীতি এবং নিজ নিজ ধর্মে অনুরাগ ছিল। ছোট বেলার বঙ্কিমকে (মা-কামিনী সুন্দরী কর্তৃক প্রদত্ত নাম) একদিন পুকুরের পানি থেকে উদ্ধার করেছিল আমীর মোল্লা। সেই থেকে দুটি পরিবারে বন্ধন সুদৃঢ় হতে থাকে। অবশ্য এর পেছন তার মায়ের ভূমিকাই বেশি ছিল। মায়ের এই ঔদার্য পুত্র বঙ্কিমের মনে এক গভীর রেখাপাত করে। তাঁর মনে জাতিভেদ চিন্তা দূর হয় এবং বদ্ধমূল হয় আমরা মানুষ।[১৬]

রাজনৈতিক অবস্থা

রাজনৈতিক অবস্থা ছিল উত্তাল ও অশান্ত। শাসন ক্ষমতায় ছিল ইংরেজ। দেখেছেন ইংরেজদের কুটিলতা, স্বার্থপরতা, অহংকার ও বিজাতীয়দের প্রতি ঘৃণা। দেখেছেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে দুর্বার বঙ্গভঙ্গরদ আন্দোলন ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। বাঙালির রাজনৈতিক

সচেতনতা ও ঐতিহ্য গৌরবময় ও সমীহ যোগ্য। এ প্রসঙ্গে গোখলের একটি উক্তি উদ্ধৃত করা হলো-

What Bengal thikns today
India thinks it tomorrow and the whole world
thinks it day after tomorrow.[১৭]

অর্থনৈতিক অবস্থা

বৃটিশ শাসকরা বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা প্রায় ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। কারণ আমাদের শ্রম, উৎপাদন, পরিবেশ, ব্যবসায় বাণিজ্য সবই তাদের ইচ্ছামত পরিচালনা করত।

এমনি ক্রান্তি লগ্নে বাংলার সূর্য সন্তান, বাঙালি দার্শনিক, বৈষ্ণব আচার্য সৌম্য, মান্ত, ধীর, সুশীল, সুশিক্ষিত মানব প্রেমিক মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ৯ পৌষ (১৩১১), ২৫ ডিসেম্বর ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে বরিশাল জেলার খলিশাকোটা গ্রামে একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মা, মাটি ও মানুষের অবস্থা নিয়ে মহানামব্রত বলেন,

The whole world our family
The sky our canopy, nature our bed
Earth our world mother, all beings brothers.
Hari purusa Jagad Bandhu over our head.[১৮]

৫ বছর বয়সের আগেই লেখাপড়ার হাতেখড়ি নেন বালক বঙ্কিম দাসগুপ্ত (মা-কামিনী সুন্দরী কর্তৃক প্রদত্ত নাম)। লেখাপড়ায় ছিল তাঁর গভীর মনোযোগ ও আকর্ষণ। ছোটবেলাতেই মাঝে মাঝে হরিনাম সংকীর্তনে চলে যেতেন। মনে রাখা দরকার ছাত্র হিসেবে বঙ্কিম অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। পাশের গ্রামেই ছিল রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা। বঙ্কিম সেখানে যেতেন এবং সেবার কাজ পরিদর্শন করে মনে পরম আনন্দ অনুভব করতেন। সেই থেকে বালক বঙ্কিমের মনে মানব সেবার বীজ অঙ্কুরিত হয়।

মহাত্মা গান্ধীর ডাকে Non-Cooperation Movement এ যোগ দিলেও গুরুদেব মহেন্দ্রজীর দেয়া শর্ত পূরণ করে মেট্রিক পরীক্ষায় বঙ্কিম District Scholarship পেয়ে উত্তীর্ণ হন। এরপর তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সুদীর্ঘ ৮০ মাইল পদব্রজে অতিক্রম করে ফরিদপুর অঙ্গণে পৌঁছালেন এবং মহেন্দ্রহীর কাছে প্রার্থনা জানালেন আশ্রম জীবন লাভ করার। সুযোগ পেয়ে গভীর নিষ্ঠা ও ভালোবাসা উজাড় করে দিয়ে সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। এ কাজে মহেন্দ্রজী প্রীত হয়ে বঙ্কিমের নতুন নাম দিলেন

"মহানামব্রত ব্রহ্মচারী" অর্থাৎ যারা মহানাম ব্রতী তুমি তাঁদের দাস। কিছুদিন পর গুরুদেব মহেন্দ্রজী মহানামব্রত ব্রহ্মচারীকে কলেজে ভর্তির আদেশ দিলে মহানাম বিনীতভাবে বলেন, আবার লেখাপড়া শেখা কেন? এর উত্তরে মহেন্দ্রজী বলেন, শোন মহানাম দু'টি কারণে আমি তোমার উচ্চ শিক্ষা চাই।

প্রথমত: ঈশোপনিষদে বলা হয়েছে-

"বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যায়ামৃত মশ্নুতে"[১৯]

অর্থাৎ- "বিদ্যা ও অবিদ্যা যিনি এই উভয় প্রকার বিদ্যা অবগত হন, তিনি অবিদ্যার দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করেন এবং বিদ্যার দ্বারা অমৃত লাভ করেন।" ঈশোপনিষদেও ১১ নং শ্লোকের মর্মার্থ নিম্নরুপ:

বিদ্যা হলো স্রষ্টাজ্ঞান/ ব্রহ্মজ্ঞান/ ঈশ্বরজ্ঞান/ দেবতাজ্ঞান আর অবিদ্যা হলো- জাগতিকজ্ঞান/ সংসারকর্ম। যারা শুধু অবিদ্যা নিয়ে ব্যস্ত তারা অন্ধকারে আছে। আবার যারা শুধু বিদ্যা নিয়ে লিপ্ত থাকে তারা আরও অধিক অন্ধকারে বসবাস করছে। কাজেই মনীষীগণ বলেন, যখনই উভয় প্রকার বিদ্যার সমন্বয় ঘটবে তখনই কেউ মৃত্যুকে অতিক্রম করে অমৃত লাভ করতে পারবে।

এ প্রসঙ্গে চৈতন্য ভাগবতে বলা হয়েছে-

"পড়ে কেন লোক কৃষ্ণ ভক্তি শিক্ষা তরে
তাহা যদি না হইল বিদ্যায় কি করে"[২০]

সুতরাং অবিদ্যা অর্জন করে কৃষ্ণ ভক্তি শিক্ষা লাভ হয় এবং ঈশ্বরকে পাবার একটা ব্যাকুলতা হৃদয়ে সৃষ্টি হয়। আর বিদ্যা দ্বারা এই সকল বিষয় উপলব্ধি করে অমৃত লাভ করবে।

দ্বিতীয়ত, "প্রকৃত বিদ্যার্জন যে দাসসুলভ মনোবৃত্তি জাগায় না, সেকথা আমি তোমাকে দিয়ে প্রমাণ করতে চাই।"[২১]

গুরুদেবের কথামতো ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজে ভর্তি হলেন এবং প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হলেন। তারপর ১৯৩০ খ্রি. অসুস্থ শরীর নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথমে সংস্কৃতে বি এ (সম্মান) প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকারসহ স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন ও পরে দর্শনে এম. এ করেন। অতঃপর ১৯৩৭ খ্রি. এ আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শ্রীজীব গোস্বামীর উপর গবেষণা করে The philosophy of Sri Jiva Goswammi Vaisnava vedeanta of the Bengal School শীর্ষক

অভিসন্দর্ভ রচনা করে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। বৈষ্ণব আচার্য হতে যাদের প্রেরণা ও আশিষ পেয়েছেন। তারা হলেন- বাবা কালিদাস গুপ্ত, মা-কামিনী সুন্দরী, মামা- বনমালী সেনগুপ্ত, সংকর্ষণ (পূর্ব নাম ছিল রাজেন্দ্র কিন্তু জগদ্বন্ধু সুন্দর কর্তৃক নাম দেওয়া হয় সংকর্ষণ) গুরুদেব মহেন্দ্রজী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক পণ্ডিত পঞ্চানন তর্কবাগীশ, শ্রী জগদ্বন্ধু সুন্দর, শ্রীজীব গোস্বামী। নানা ভাবনা-চিন্তা যখন মনের মধ্যে প্রতিনিয়ত দোল খায় তখন সংকর্ষণ মহানামব্রতকে জিজ্ঞেস করলেন, *চৈতন্য ভাগবত* গ্রন্থখানা পড়েছ তো? কেমন লাগছে? ইত্যাদি। উত্তরে মহানামব্রত জানালেন ভালো লাগছে। কথাবার্তার একপর্যায়ে সংকর্ষণ এক টুকরো কাগজ বের করে মহানামব্রতকে দিলেন যাতে আড়াআড়িভাবে লিখা ছিল-

কোথা হইতে?
কে?
কেন?
কোথায়?
কি?

মহানামব্রত এর মর্ম উদঘাটন করতে ব্যর্থ হলে সংকর্ষণ তাঁর প্রদত্ত কাগজে লিখিত প্রশ্নগুলোর মর্ম পর্যায়ক্রমিক যে শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা মহানামব্রতের জীবন চেতনাকে দারুণভাবে বৈষ্ণবীয় ধারায় অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

মহেন্দ্রজী ভাবলেন, মহানামব্রতের পড়াশুনা হলো। এবার তাঁকে ধর্ম প্রচারের কার্যে পাঠাতে হবে। ভাবনার সাথে সাথেই হঠাৎ একদিন ডাকযোগে মহেন্দ্রজীর হাতে একটি চিঠি পৌঁছল। চিঠিটি এসেছে সুদূর আমেরিকা থেকে। "World Fellowship of Faiths" শীর্ষক বিশ্বধর্ম সম্মেলনের নিমন্ত্রণ পত্র। মহেন্দ্রজী আশ্রমের সবার সাথে আলোচনাক্রমে মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর নাম প্রস্তাব করলে সবাই পরম আনন্দে তাঁকে সমর্থন করেন। গুরুদেবের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়ে দৃঢ় চিত্ত নিয়ে অনেক কষ্ট স্বীকার করে বিশ্বধর্ম সম্মেলন ১৯৩৩ শিকাগো শহরে পৌঁছলেন। অবশেষে মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত। বক্তব্য রাখলেন এবং বক্তব্যেও শিরোনাম ছিল নিম্নরূপ-

"অহিংসা, মহাত্মা গান্ধী ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব, প্রভু জগদ্বন্ধু, হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু।" [২২]

বিশ্বধর্ম সম্মেলনের পর তাঁর ভাষণের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল, তখন "International Fellowship of Faiths" এর কর্মকর্তাগণ একটি "Inter Cultural Committee" নামে নতুন একটি কমিটি গঠন করেন। এই নবঠিত

Committee এর Secretary পদ অলংকৃত করেন মহানামব্রত ব্রহ্মচারী। তিনিই হলেন প্রথম ভারতীয়, তথা এশিয়া মহাদেশের অধিবাসী যিনি প্রথম এই দুর্লভ সম্মানের অধিকারী হন। যেহেতু ব্রহ্মচারীজীর দর্শন শ্রীজীবের মতানুসারী সেহেতু ব্রহ্মচারিজীর দর্শনেও শ্রী জীবের দর্শনের প্রভাব থাকা খুবই সঙ্গত ও স্বাভাবিক। মহানামব্রত ব্রহ্মচারির দর্শনের মূলতত্ত্ব শ্রী জীবের দর্শনের অনুরুপ। শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণ মহাপ্রভু গৌরহরিকেই পরমতত্ত্ব বলে স্বীকার করেছেন।

আর ব্রহ্মচারিজী নিত্যানন্দ ও গৌরহরির মিলিত স্বরুপ "প্রভু জগদ্বন্ধু হরি" কে পরমতত্ত্ব বলেছেন কারণ চৈতন্য চরিতামৃতে উক্ত হয়েছে-

চৈতন্য লীলামৃতপুর কৃষ্ণলীলা সুকর্পুর
দহুমিলি হয় সুমাধুর্য্য
সাধুগুরু প্রসাদে তাহা যেই আস্বাদে
সেই জানে মাধুর্য্য প্রাচুর্য্য।[২৩]

অর্থাৎ গৌরলীলা ও কৃষ্ণলীলা একক হয়ে যে মাধুর্য্য সৃষ্টি হয়েছে তাই শ্রী শ্রী প্রভুজগদ্বন্ধু রূপে প্রকাশিত হয়েছেন।

মহানামব্রত ব্রহ্মচারির বৈষ্ণব দর্শনের বিশ্লেষণ

বৈষ্ণব বেদান্ত

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী তাঁর গবেষণা গ্রন্থ *বৈষ্ণব বেদান্তে* বলেন,

> Vedantism is not only a speculative philosophical discipline but also a very practical religion. It is a theology and philosophy in one. A true Vedantist is not only a thinker and theologian but also a seer to a certain extent.[২৪]

বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ স্বামী প্রত্যগাত্মনন্দ সরস্বতী মন্তব্য করেছেনঃ শ্রীজীব গোস্বামীর দর্শনে ভগবানই হলেন পরম সত্য, তিনি প্রেম ও লীলার ভগবান, এবং তাই এই দর্শন স্বাভাবিকভাবে শঙ্করাচার্যের সিদ্ধান্তের উপর আধারিত না হয়ে রামানুজাচার্যের প্রতিবাদী সিদ্ধান্তের উপর আধারিত। কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় উপনিষদের ব্রহ্ম তাঁর (ভগবানের) তনুভা।[২৫] ব্রহ্মচারী তাঁর গ্রন্থে লীলাবাদী বেদান্তের উল্লিখিত বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে স্বামী প্রত্যগাত্মনন্দ সরস্বতী বলেন,

> It is compprehensive and comparative; synthetic in its summing-up; logical in its analysis; lucid in its expression. Many a congenial stream of love and wisdom from the East and the West has been

brought to a happy confluence here where the reader who aspired to see and enter can bathe for stimulating light and delight.[২৬]

উক্ত গ্রন্থে দার্শনিক সত্তা মীমাংসা প্রথম খণ্ডে বিচারের পর শঙ্করাচার্যেও ও রামানুজাচার্যের বেদান্ত দর্শনের আলোচনা করা হয়েছে।। তারপর গৌড়ীয় বৈষ্ণব বেদান্তের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদেও প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় খণ্ডে ব্রহ্মতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব এবং বৈষ্ণব নীতিশাস্ত্রের আলোচনা আটটি অধ্যায়ে করা হয়েছে। চৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর যে মত কবিরাজ গোস্বামী পরিবেশন করেছেন এবং তার দার্শনিক বিশ্লেষণ শ্রীজীব গোস্বামী যেভাবে করেছেন তাঁর সহজ সুন্দর আলোচনা এই গ্রন্থে আছে।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে সুসাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেন বলেছেন,

> আপনার *গীতা-ধ্যান* একটি বিস্ময়কর গ্রন্থ। গীতার অন্তর্নিহিত অভ্রান্ত অর্থটিকে উপলব্ধির সহজ আলোতে উদঘাটিত করেছেন। সমস্ত কর্মালেবরের অন্তরে শুনতে পাচ্ছি একটি অতন্দ্র স্তব্ধতা, দেখতে পাচ্ছি একটি পরম বিরাম শান্তি। ধ্যানে সমাসীন না হলে উদ্ধার করতে পারা যায় না সেই অব্যক্তকে সেই গুহ্যাশয়কে। আপনার লেখার গুণ এই যে, সে হৃদয়ে ধ্যানের লাবণ্য বিস্তার করে আর সেই ধ্যান বির্মঢ় নিশ্চল নয়, সঙ্গীতস্পন্দিত। সহসা বিশ্বাস হয়, অন্তরগহন খনন করলেই আবিষ্কার করতে পারব সেই ধ্যানসুন্দরকে। আমার ভক্তি বিনম্র অভিবাদন গ্রহণ করুন।[২৭]

অষ্টাদশ অধ্যায়ের টীকাতে সর্বগুহ্যতম রহস্য সম্বন্ধে ব্রহ্মচারীজী বলেছেন, "কিভাবে সর্বভাবে আমাকে পাইবে তাহা বলি শোন। একবার বলিয়াছি রাজবিদ্যা রাজগুহ্য যোগে, আবার বলি-

মন্মনা হও-সমস্ত মনটা আমাকে দেও।
মদ্ভক্ত হও-সর্বাপেক্ষা প্রিয়বস্তু আমি ইহা অনুভব কর।
মদ্‌যাজী হও-যাহা কিছু কর সবই যজ্ঞ বুদ্ধিতে কর।

এবং সকলই আমার উদ্দেশ্য, আমার প্রীত্যর্থে কর। আর আমাকে নমস্কার কর-তোমরা শির অবনত করিয়া রাখ আমার পায়ে। তোমার সাল অহংকার বিলাইয়া দাও আমার চরণে। একটি নমস্কারে সকল উজাড় করিয়া দাও। অর্জুন আমার শরণ লও। আর সকল ভুলিয়া যাও। সকল ধর্ম ত্যাগ কর।"[২৮]

চন্ডীচিন্তা

চন্ডী হিন্দুদের নিত্যপাঠ্য পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। মহর্ষি ব্যাসদেব রচিত চন্ডী অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্যতম মার্কন্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত। এতে জগদ্মাতা দেবী দুর্গার মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে

বলে একে 'দেবী মাহাত্ম্য'ও বলা হয়। মার্কন্ডেয় পুরাণে ৮১ তম হতে ৯৩ তম অধ্যায় পর্যন্ত মোট ১৩ টি অধ্যায়ের নামই চন্ডী। ৫৭৮ টি শ্লোক এবং ৭০০ টি মন্ত্র রয়েছে চন্ডীতে। মোট ৭০০ টি মন্ত্র থাকায় এর অপর নাম সপ্তশতী। মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর লেখা *সপ্তশতী সমন্বিত চণ্ডীচিন্তা* পড়লে মনে হয় বৈষ্ণব পণ্ডিতও সম্যক্‌দর্শী উদারপন্থী হলে হিন্দু শাস্ত্রের মধ্যে সমন্বয়ের বাণী কিভাবে উপলব্ধি করতে পারেন, মহামহোপাধ্যায় আচার্য গোপীনাথ কবিরাজ যেমন বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ তন্ত্রবিদ্যা বিশারদ হয়েও *শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ* লিখে বৈষ্ণব বেদান্তে ও তন্ত্রশাস্ত্রের অপূর্ব সমন্বয় বাণী কিভাবে উপলব্ধি করতে পারেন, মহামহোপাধ্যায় আচার্য গোপীনাথ কবিরাজ যেমন বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ তন্ত্র-বিদ্যাবিশারদ হয়েও 'শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ লিখে বৈষ্ণব বেদান্তে ও তন্ত্রশাস্ত্রের অপূর্ব সমন্বয় দেখিয়েছেন, তেমনি বিংশ শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব বৈদান্তিক সহজ সরল প্রাণস্পর্শী ভাষায় *চণ্ডীচিন্তা* লিখে অপূর্ব সমন্বয়ের দৃষ্টিকোণ দেখিয়েছেন।

এ গ্রন্থের ভূমিকায় পণ্ডিত অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক ভৌতবিজ্ঞান, তন্ত্রশাস্ত্র ও বেদান্তের মধ্যে যে সেতু নির্মাণের প্রচেষ্টা ব্রহ্মচারীজী করেছেন তার প্রশংসা করে মন্তব্য করেছেন, "পরম ভাগবত সর্বশাস্ত্রমর্মার্থদর্শী শ্রীমান মহানামব্রত ব্রহ্মচারী *চণ্ডীচিন্তা* গ্রন্থে মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবীমাহাত্মের যে চমৎকার তত্ত্ববিশ্লেষণ করেছেন, তা ভাষার ললিত্যে, ভাবের গাম্ভীর্যে, যুক্তির নৈপুণ্যে, অনুভূতির প্রগাঢ়তায়, সকলেরই হৃদয়াকর্ষক হবে নিঃসন্দেহ।"

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী প্রস্থানত্রয় (*উপনিষদ*, *ব্রহ্মসূত্র* ও *গীতা*) এবং দেবীমাহাত্ম্য সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন, "প্রস্থানত্রয় জ্ঞানশাস্ত্র, চণ্ডী বিজ্ঞানশাস্ত্র। জ্ঞানে বিজ্ঞানে বিরোধিতা নাই। একই সত্যানুসন্ধিৎসা ও একবাক্যতা আছে। জ্ঞানশাস্ত্রে নির্মল সত্য (pure truth), বিজ্ঞানশাস্ত্রে প্রযুক্ত সত্য (applied truth)। জ্ঞানের দ্বারা আনীত সত্য, বিজ্ঞান পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা স্থাপন করে। বেদাদি শাস্ত্রের মহাসত্য, চণ্ডী আধ্যাত্মিক পরীক্ষা দ্বারা অর্থাৎ সাধন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।"[২৯]

উপনিষদ ভাবনা

মহানামব্রত ব্রহ্মাচারী দুই খণ্ডে *উপনিষদ ভাবনা* বাংলা ভাষার সাধারণ শিক্ষিত মুমুক্ষ পাঠকের জন্য এক উপাদেয় গ্রন্থ। প্রথম খণ্ডে ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, শ্বেতাশ্বতর ও প্রশ্ন উপনিষদের মূলসহ সাল ব্যাখ্যা হয়েছে এবং বেদান্তের লীলাবাদী ভাষা অনুযায়ী নির্গুণ ব্রহ্ম থেকে গণাধীশ ঈশ্বরতত্ত্বের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির শেষ মন্ত্রের অনুবাদে তিনি ঈশ্বরে ও গুরুতে ভক্তির উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন, "যাহার পরম পুরুষে পরাভক্তি আছে এবং ঠিক তেমনি

ভক্তি শ্রীগুরুপাদপদ্মে আছে সেইরুপ মহাত্মার নিকটেই এই সকল তত্ত্ব সম্যগভাবে স্ফূরিত হয়।"[৩০]

এ খণ্ডের ভূমিকায় হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "মহানামব্রত ব্রহ্মচারী একটি বিখ্যাত নাম। দ্বৈতবাদী সাধক হিসাবে তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংস্কৃতি জগতে সুপরিচিত। তাঁর আলোচনার মধ্যে দু'টি জিনিস আমাকে বিশেষ মুগ্ধ করেছে। প্রথমটি হল তাঁর ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রে অনন্য-সাধারণ ব্যুৎপত্তি। শ্রুতি-প্রস্থান, ন্যায়প্রস্থান ও স্মৃতিপ্রস্থানে তিনি স্বাচ্ছন্দে বিচরণ করবার ক্ষমতা রাখেন।"[৩১]

দ্বিতীয় খণ্ডে বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষদের হৃদয়গ্রহী ব্যাখ্যা আছে। এই খণ্ডেও বৈষ্ণবধর্মের বৈদিক সমর্থন বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যেহেতু দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয় মতবাদই বৈদিক। শ্রী গৌরাঙ্গদেবের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের সমর্থন এই উভয় উপনিষদের ব্যাখ্যাতেই পাওয়া যায়। গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁর 'মুখবন্ধ' প্রবন্ধে লিখেছেন,

> ব্রহ্মচারীজি অধ্যায়গুলির প্রাঞ্জল বাংলায় তাৎপর্য যেমন দিয়েছেন, তেমনি অধ্যায় শেষে তাঁর ভাবনা বা সারার্থ-চিন্তন যোগ করে দিয়েছেন, যার আলোকে অধ্যায়গুলির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উদ্ভাসিত হয়েছে। তাঁর এই প্রাঞ্জল ব্যাখ্যার সাহায্যে অনেক জিজ্ঞাসু ও তত্ত্বান্বেষী পাঠক এ দুইটি অতি দুরুহ উপনিষদের মর্ম উদ্ধারে অনায়াসে সক্ষম হবেন, এতে সন্দেহ নেই। তাঁর সারস্বত অবদান বঙ্গভাষাকে যেভাবে সমৃদ্ধ করল, তাতে এই অকিঞ্চন সন্ন্যাসীর অতুলনীয় সম্পদের কথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।[৩২]

বেদ-বেদান্ত: পূর্বখণ্ড: ব্রহ্মসূত্র

বৈষ্ণব-বেদান্ত-শিরোমণি মহানামব্রত ব্রহ্মচারী অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ দর্শন অনুযায়ী ব্যাসদেবকৃত ন্যয়প্রস্থান ব্রহ্মসূত্রের যে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে সুন্দরভাবে সন্ন্যাসী গোষ্ঠীর মায়াবাদী ভাষ্য এবং বৈষ্ণবচার্য্য গোষ্ঠীর লীলাবাদী ভাষ্যের মূল বক্তব্য পাশাপাশি রেখেছেন। ব্রহ্মের স্বরুপ লক্ষণ (সচ্চিদানন্দস্বরুপ) এবং তটস্থলক্ষণ (সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী ঈশ্বরশক্তি) সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা পাঠকের মনে সহজেই পরিস্ফুট হবে এবং চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থপাদের জগদ্ব্যাপার-বর্জাধিকরণের ব্যাখ্যা অনুযায়ী যখন বোঝা যাবে যে মুক্ত পুরুষের জগৎ সৃষ্টি-স্থিতি-লয় প্রভৃতি ঈশ্বরীয় কার্য ভিন্ন অন্য ব্যাপারে ব্রহ্মসাম্য থাকতে পারে তখন অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের রহস্য হৃদয়ঙ্গম হবে। এই গ্রন্থের আরম্ভে শ্রীঅমলেশ ভট্টাচার্যের ভূমিকা, ধ্যানেশনারায়ন চক্রবর্তীর প্রস্তাবনা এবয়গ্রন্থকারের উপোদ্‌ঘাত গ্রন্থটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করেছে। গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় ব্রহ্মচারীজির

উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে লিখেছেন, "আমাদের অশেষ সৌভাগ্য, এই ঘোর অন্ধকারময় কলিযুগের দুর্দিনেও এমন একজন আচার্য আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছেন, ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারীরূপে।"[৩৩]

বেদ-বেদান্ত: উত্তর খণ্ড: বেদ-বিচিন্তন

এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থে ব্রহ্মচারীজি বেদের বিভিন্ন তত্ত্বের ও তথ্যের ব্যাখ্যা কিছুটা শ্রীঅরবিন্দের শাক্ত দৃষ্টিতেও কিছুটা শ্রীমদ্ভাগবতের বৈষ্ণব বেদান্ত দৃষ্টিতে অতি সরল ও স্পষ্টভাবে বোঝবার চেষ্টা করে সফল হয়েছেন। অধ্যাপক অমরকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, "মহানামব্রতজী বেদের মধ্যে শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি, বাৎসল্যরতি ও মধুররতি এই পঞ্চরসের সন্ধান পেয়েছেন। এর মধ্যে সখ্যরতিরই যে বেদের প্রাধান্য তাও তিনি বলেছেন।"[৩৪]

ভক্তদের দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রীমন্ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী পাঁচখণ্ডে লিখিত ও প্রকাশিত শ্রীমদ্ভাগবত তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলে মনে করা হয়। কেননা এতে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের অর্থ্যাৎ শ্রীকৃষ্ণের মর্তে আবির্ভাব থেকে নিয়ে গিরিশের সঙ্কট-মোচন পর্যন্ত যে অপূর্ব রস-মধুর লীলাকথার বর্ণনা আছে তাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোক্তি 'গ্রন্থরুপে ভাগবত কৃষ্ণ-অবতার' (শ্রীচৈ.ভা.) বুঝতে ভক্তের সুবিধা হয়। ভগবতে বিশেষ বার্তা সমন্ধে গ্রন্থকার প্রথম খণ্ডের ভূমিকাতে বলেছেন- (১) তিনি (ভগবান) আছেন এটা প্রাচীন বার্তা, তিনি কলিহত সংসারী জীবকে করুণা করে আসেন তা ভাগবর্তী বার্তা, (২) 'ভগবান্ ডাকেন, মধুর মুরলীর তানে, মুরলীয়া তোমাকে আকুল প্রাণে আহ্বান করছেন, (৩) ভাবনার মধ্যে ভাবাতীত; বেদান্ত বলছে ব্রহ্মের কথা, তিনি অরুপ, অস্পর্শ, অব্যয়; নির্গুন, নিরাকার নির্বিশেষ পরব্রহ্মের সগুণ সাকার সবিশেষ অনুবাদই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। (৪) তিনি সুন্দরতম; তাঁর চারটি মাধুর্য... রুপমাধুর্য, বেণুমাধুর্য, প্রেমমাধুর্য ও লীলামাধুর্য।

পঞ্চম খণ্ডের দশম স্কন্ধের উপসংহার ফেলালবে ব্রহ্মচারীজি বলেছেন, "ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান, ভক্তিলাভ হইলে সর্ব অমঙ্গল নাশ হয়।"[৩৫]

শ্রীকৃষ্ণের শেষ উপদেশ

ভগবত-রত্ন মহানামব্রত তাঁর ৯৬ পৃষ্ঠার পুস্তিকায় (*শ্রীকৃষ্ণের শেষ উপদেশ*) শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে ঊনত্রিশ অধ্যায় পর্যন্ত উদ্ধব-গীতার সাবলীল সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করে ভক্তদেও বিশেষ করে বাণপ্রস্থী ও সন্ন্যাসী ভক্তদের অশেষ কল্যাণ সাধন করেছেন। মহাভারতের অংশ ভগবদ্‌গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের অংশ এই

'উদ্ধব গীতা' পাঠ করলে আমরা শ্রীকৃষ্ণের সম্পূর্ণ উপদেশের একটু আভাস পাই। শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী বলতেন, "হরি কথাই কথা, আর সব বৃথা ব্যথা"। এই হরিকথা আমরা এই দুই গ্রন্থে যেমন সহজে পাই, তা আর অন্য কোনো গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

সাধারণত বৈষ্ণব ধর্মের অনুসারীগণ শংকারাচার্যের ঘোর সমালোচক। বৈষ্ণব দর্শনের উদ্ভব হয়েছে রামানুজ আচার্যের হাত ধরে তিনি শংকরাচার্যের মায়াবাদের বিরুদ্ধে যে ৭টি ভ্রান্তির কথা উল্লেখ করেছেন তা অকাট্য না হলেও অত্যন্ত শক্ত ও জোরালো। তাই সাধারণ বৈষ্ণবেরা শংকরাচার্যের কথা মানতে রাজি নন যে, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য তার জগৎ মিথ্যা। তাঁদের মতে, ব্রহ্মও সত্য জগৎও সত্য। ব্রহ্মের সাথে একাত্মা হওয়াই অদ্বৈত বেদান্তের মূল লক্ষ্য। কিন্তু বৈষ্ণব দর্শন অনুসারে প্রতিটি জীবকে ভাল না বাসলে ব্রহ্মকে লাভ করা যাবে না। শংকরাচার্য যেখানে বেদের জ্ঞান মার্গের উপর জোর দিয়েছেন সেখানে বৈষ্ণবগণ ভক্তি মার্গের উপর জোর দিয়েছেন। কিন্তু মহানামব্রত ব্রহ্মচারী একজন প্রথম শ্রেণির বৈষ্ণব দার্শনিক হওয়া সত্ত্বেও অদ্বৈত বেদান্ত ও বিশুদ্ধ অদ্বৈত বেদান্তের মধ্যে যে বিরোধ তাকে অতিমাত্রায় আমল দেননি। তিনি ছিলেন সমন্বয়বাদী বৈষ্ণব দার্শনিক। তাই তাঁর দর্শনে দেখা যায় বেদান্ত দর্শনের যে ৬টি ভাগ (১) অদ্বৈতবাদ- শংকরাচার্য (২) দ্বৈতবাদ-মধবাচার্য (৩) বিশিষ্টা দৈতবাদ- রামানুজাচার্য (৪) স্বাভাবিক দ্বৈতাদ্বৈতবাদ- নিম্বার্কাচার্য (৫) শুদ্ধাদ্বৈতবাদ- বল্লভাচার্য (৬) অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ- শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য তার চমৎকার একটি সমন্বয়। তিনি ভক্তিমার্গের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিলেও জ্ঞানমার্গকে উপেক্ষা করেননি। তাঁর মতে একজন সাধককে জ্ঞানমার্গ, কর্মমার্গ ও ভক্তিমার্গ এ তিনের মাঝেই মানুষের মুক্তি ও আনন্দ। হারান বন্ধু ব্রহ্মচারী তাঁর গবেষণা গ্রন্থ *ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজির জীবন ও বৈষ্ণব দর্শন* এর উৎসর্গে মহানামব্রত ব্রহ্মচারির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, "পার্থিব সকল আকর্ষণ ত্যাগ করে শৈশবে ছুটে এসেছিলেন যিনি বন্ধুহরির রাতুল চরণে। খ্যাতির শীর্ষে উঠেও যিনি ছিলেন গুরুর চরণে নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠায়। সকল বন্ধু পার্ষদের যিনি ছিলেন স্নেহের পুত্তলি। লেখনি মুখে যাঁর পীযূষ ধারা। শ্রীমুখে নিঃসৃত ভাগবতীয় নির্ঝর। দানে যিনি ভুরিদা। দ্বিতীয় বিশ্বধর্ম সম্মেলনে যিনি পেয়েছিলেন এশিয়ার দুর্লভ সম্পাদকের সম্মান। অথচ ছিলেন একেবারে নিরভিমান। অগণিত ভক্তের আরাধ্য দেবতা। অশেষ করুণায় মাদৃশ পতিত জনেরও যিনি দিয়েছিলেন চরণে স্থান।" মহানামব্রত ব্রহ্মচারী এমন একজন বিরল মহাপুরুষ যিনি নিজের সাধনাবলে একদিকে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সর্বোচ্চ শিখরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন অপর দিকে তাঁর নৈসর্গিক মেধার সাহায্যে তিনি সর্বপ্রকার শাস্ত্রগ্রন্থ সূক্ষ্মভাবে অধ্যয়ন করে সেগুলি হতে তার সারমর্ম সঞ্চয় করেছিলেন, যা তিনি জনসাধারণের সমক্ষে সহজভাবে সরল ভাষায় পরিবেশন করেছিলেন। তিনি তাঁর অসাধারণ বাগ্মিতার জন্য দেশ বিদেশে খ্যাতি লাভ

করেছিলেন। বাংলা, ইংরেজি সংস্কৃত এই তিন ভাষায় তিনি সমান রূপে দক্ষ ছিলেন। তিনি নিজে বৈষ্ণবপন্থী ছিলেন কিন্তু কোন মতবাদের গোঁড়ামী বা সংকীর্ণতা তাঁকে কখনও স্পর্শ করতে পারেনি। তাঁর দৃষ্টি ছিল স্বচ্ছ ও ব্যাপক, হৃদয় ছিল উদার, তাই তিনি কোন প্রকার বাছ-বিচার না করে সর্বপ্রকার শাস্ত্রীয় গ্রন্থ অধ্যয়ন করে সেখান থেকে অমৃতোপম আধ্যাত্মিক জ্ঞানরুপী প্রসাদ গ্রহণ করেছিলেন। *বেদ, উপনিষদ্, ভগবদ্গীতা, ভাগবত, বেদান্ত, চণ্ডী*, তন্ত্র প্রভৃতি নানা প্রকার শাস্ত্রে তাঁর সঞ্চরণের গতি ছিল অবাধ। এ পরিচয় তাঁর অজস্র রচনা থেকে আমরা পেয়ে থাকি। আমাদের বর্তমান সমাজব্যবস্থায় যে ভেদের রাজনীতি-সংস্কৃতি-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিরাজমান মহানামব্রত ব্রহ্মচারী তাঁর অভেদের ও শান্তির দর্শনের দ্বারা তার বিরোধিতা করেছেন। তাঁর চিন্তা, জীবন ও কর্ম আমাদের অহিংসা ও শান্তির পথনির্দেশ করে। কোনো ধর্মীয় গণ্ডির ভেতরে তাঁর দর্শনকে আবদ্ধ করে ফেলার সুযোগ নেই। যুক্তি ও বিচারের নিরীখে জীবনকে পর্যালোচনার দ্বারা তিনি শান্তি আনয়নের পথ দেখিয়েছেন। প্রবল ইচ্ছা শক্তি থাকলেই দক্ষতা ও যোগ্যতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করা যায়, মহানামব্রত ব্রহ্মচারী একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। উপর্যুপরি আলোচনার দ্বারা তাঁর জীবনদর্শকে সমাজে প্রতিষ্ঠার দায় এখন সকলের। একজন বৈষ্ণব আচার্য হওয়া সত্ত্বেও মহানামব্রত ব্রহ্মচারী অন্য ধর্ম ও ধর্মীয় ভাবনার প্রতি সমানভাবে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তা তাঁর লেখা ও ভাষণ থেকে বোঝা যায়। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সুশিক্ষিত শিক্ষকদের সাথে যেমন সহজে মিশতেন অন্যদিকে গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের সাথে অবাধে মেলামেশা করে উভয়েই সন্তুষ্ট করতে পারতেন।

এমনকি তাঁর মেলামেশা থেকে বাদ যায়নি ফরিদপুর জেলার উপকণ্ঠে বাস করা ডোম, বাগদী ও অন্ত্যজ শ্রেণির লোকও। এর মূলে কাজ করেছে শ্রীচৈতন্য দর্শনের মর্মবাণী। শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে উল্লেখ আছে-

কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাহা কৃষ্ণস্ফুরে।[৩৬]

যাঁর অন্তর শুদ্ধ সাত্ত্বিক স্তরে উন্নীত হয় সর্বজীবের মধ্যে ভগবত দর্শন তাঁরই হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করতে পারি প্রভু জগদ্বন্দুসুন্দরের অমিয় বাণী, "জীব দেহে নিত্যানন্দের বাস"।[৩৭] অর্থাৎ সকল জীবের মধ্যেই ভগবান বিরাজিত আছেন। এমনি ভাব অন্তরে বিকশিত হলেই জগতের জীবকে ভালবাসা সম্ভব হয়ে থাকে। মানুষে মানুষে যে বেদরেখা (তা অজ্ঞানতার কারণে জাত হয়) আর থাকে না। মানুষের মাঝে জাত, পাত, বর্ণ, ধর্ম সব মিলে একাকার হয়ে যায়। এমন সার্বভৌম ভাবনার এক সিদ্ধ পুরুষ বিশ্ববিশ্রুত দার্শনিক ও মহান বৈষ্ণব মহানামব্রত ব্রহ্মচারী।

তথ্যনির্দেশ

১. নিখিল ভট্টাচার্য্য, *কথা মন্দাকিনী* (নির্বাচিত প্রবন্ধ ও বক্তৃতা), শ্রী অভিজিৎ ভট্টাচার্য্য শ্রীমঙ্গল বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা-১৫

২. রশীদুল আলম, *মুসলিম দর্শনের ভূমিকা*, হামিদা খাতুন সাহিত্য সোপান বগুড়া, ১৯৬৯ খ্রি. পৃষ্ঠা-২৩০

৩. নিখিল ভট্টাচার্য্য, *পূর্বোক্ত*, পৃষ্ঠা- ১১৭-১১৮

৪. রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, *ভারতীয় দর্শন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩

৫. *ঐ*, পৃষ্ঠা- ৫৪৩

৬. পরিতোষ দাস, *সহজিয়া ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম*, ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃষ্ঠা-৩

৭. রামদুলাল রায়, *বাঙালির দর্শন: প্রাচীনকাল থেকে সমকাল*, সুরভী পাবলিকেশন ঢাকা, ২০০৬, পৃষ্ঠা-১৩০

৮. *প্রাগুক্ত*

৯. Mahanambrata Brahmachari, Vaishnava Vedanta of Bengal School Goudia Philosophy of Sri Jiva Goswami, Sri Mahanambrata Culture and Welfare Turst, Calcutta, 2nd. 1994, p. 2

১০. নিখিল ভট্টাচার্য্য, *চিন্ময় চিন্তন*, রত্নাভট্টাচার্য্য, ২০০৮, পৃষ্ঠা-৭-৮

১১. আমিনুল ইসলাম, *বাঙালির দর্শন: প্রাচীনকাল থেকে সমকাল*, মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-৭৮

১২. *ঐ*, পৃষ্ঠা-৭৯

১৩. শ্যামাচরণ চক্রবর্তী, *Vaishnava Cult*, রাজশাহী বরেন্দ্র রিসার্স সোসাইটি, ১৯৩০

১৪. নৃপেন্দ্র লাল দাশ, *গৌড়ায় বৈষ্ণব ধর্ম ও আধুনিক অধ্যয়ন*, সম্পাদনা ও প্রকাশক, ননী গোপাল দাস, জগন্নাথপুর, সিলেট ২০০৯ খ্রি.

১৫. Mahanambrata Brahmachari, *Vaishnava Vedanta of Bengal School Goudia Philosophy of Sri Jiva Goswami*, Sri Mahanambrata Culture and Welfare Turst, Calcutta, 2nd. 1994, p. 262

১৬. হারান বন্ধু ব্রহ্মচারী, *ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজির জীবন ও বৈষ্ণবদর্শন*, হারানবন্ধু ব্রহ্মচারী, ২৫ ডিসেম্বর, পৃষ্ঠা-৫

১৭. *ঐ*, পৃষ্ঠা-৭

১৮. হারান বন্ধু ব্রহ্মচারী, *ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজির জীবন ও দর্শন*, ডিসেম্বর ২০০৩, পৃষ্ঠা-৩

১৯. *ঐ*, পৃষ্ঠা-১৩

২০. *ঐ*, পৃষ্ঠা-১৪

২১. *ঐ*, পৃষ্ঠা-১৬

২২. *ঐ*, পৃষ্ঠা-২২১

২৩. *ঐ*, পৃষ্ঠা-৯০

২৪. Mahanambrata Brahmachari, *Vaishnava Vedanta of Bengal School Goudia Philosophy of Sri Jiva Goswami*, Sri Mahanambrata Culture and Welfare Turst, Calcutta, 2nd . 1994, p. 47

২৫. মহানামব্রত শতবর্ষ উৎযাপন পরিষদ, শ্রীমহানামব্রত শতবর্ষ স্মরণিকা, কলকাতা, ডিসেম্বর, ২০০৪, পৃষ্ঠা-১৩৭

২৬. *পূর্বোক্ত*, পৃষ্ঠা-১৩৭

২৭. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, গীতা-ধ্যান (সমগ্র), শ্রী মহানামব্রত কালচারাল এন্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, শ্রী মহানাম অঙ্গন, কলকাতা, দ্বিতীয় সং ১৯৯৫

২৮. মহানামব্রত শতবর্ষ উৎযাপন পরিষদ, শ্রীমহানামব্রত শতবর্ষ স্মরণিকা, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০০৪, পৃষ্ঠা-১৩৮

২৯. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, সপ্তশতী সমন্বিত চণ্ডীচিন্তা, শ্রী মহানামব্রত কালচারাল এন্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১৩৪ (৮ম সঃ)

৩০. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, উপনিষদ ভাবনা প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯৩ পৃষ্ঠা-১৮৬

৩১. *ঐ*, পৃষ্ঠা-২৬

৩২. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, উপনিষদ ভাবনা দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯৩

৩৩. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, বেদ-বেদান্ত পূর্বখণ্ড, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা-৭

৩৪. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, বেদ-বেদান্ত উত্তরখণ্ড, বেদ-বিচিন্তন-কলকাতা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-১৫

৩৫. মহানামব্রত শতবর্ষ উৎযাপন পরিষদ, শ্রীমহানামব্রত শতবর্ষ স্মরণিকা, কলকাতা, ২০০৪, পৃষ্ঠা-১৪০

৩৬. এম. মতিউর রহমান, *বাঙলার দার্শনিক মনীষা* (প্রথম খণ্ড), কমলাকান্তি দাস জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮

৩৭. মানস কুমার ঘোষ (সম্পা.), শত দীপালোকে মহানামব্রত, মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজীর জন্মশতবর্ষ পূর্তি উৎসব উদযাপন পরিষদ, ঢাকা: ২০০৪